নববই - এর মধ্যবিত্ত মন ও সুতনুকাদের গল্প

শম্পা চৌধুরী

১৯৯৬ সালে India Today Plus নামে একটি নতুন ঝাঁ চকচকে ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। অনেকেই হয়তো দেখে থাকবেন পত্রিকাটি। আমি একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই ওই পত্রিকাটির উদ্বোধনী সংখ্যায় অণ পুরী-র বক্তব্যে। সেখানে তিনি লিখেছেন 'The liberalization that has been sweeping across the country for the last few years has altered the lives of a large section of India's burgeoning middle class. They have become far more international in their outlook and aspirations, more sophisticated and liberal in lifestyle and attitudes, and certainly more adventurous and demanding in terms of holiday and leisure activities. One of the Psychological legacies of the Nehruvian socialistic era was that the more affluent sections of society were branded as being rather vulgar and spending money to live well was considered an even greater sin. Today, that stigma seems to have vanished for many. With the new Manmohanomics, There are many more Opportunities to make money and even more avenues to spend it.' একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে আজকের মধ্যবিত্তের বদলে যাওয়া মানসিকতা তথা দৃষ্টিভঙ্গিকেই অণ পুরী ধরিয়ে দিতে চেয়েছেন তাঁর এই সম্পাদকীয়তে । বস্তুত ১৯৯১-এর ভারতীয় অর্থনীতিকে উন্মুক্ত করে মনমোহন সিং বিশ্বায়নের যে পথ দেখিয়েছেন তা স্বাধীনতা পরবর্তী অর্থনৈতিক ধ্যানধারণাকে অনেক দূর পর্যন্ত বদলে দিয়েছে। নেহে প্রদর্শিত সাম্যসমাজবাদী আর্থসামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আজ আমরা মনমোহনোত্তর ভোগবাদী ও বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে এসে পৌঁছেছি বিংশ শতাব্দীর শেষ দশ বছরে অ ামাদের নিজেরাই তার প্রত্যক্ষদর্শী। জেরক্স এবং তারই হাত ধরে ফ্যাক্স, ই-মেল, ইন্টারনেট আমাদের লেখাপড়ার পরিচিত ধরণটাকে পালটে দিয়েছে । আর যাঁরা কলকাতায় থাকেন বা অন্য কোনো শহরে এমনকি কাছাকাছি কোনো মফস্বল টাউনে তাঁরাও নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন রাতারাতি চারপাশটা কেমন বদলে গেছে। অনেকখানি বেড়ে গেছে ইলেকট্রনিক পণ্যের বাজার,চোখ ধাঁধানো বড় দোকানগুলোতে তো বটেই এমনকি মাঝারি দোকানগুলোতেও উপচে পড়ছে দেশিবিদেশি ব্র্যাণ্ডনেমে শোভিত ভগ্যসামগ্রী। বিভিন্ন ভোগ্যপণ্যের নির্মাতারা ভারতে প্রবেশ করতে উৎসাহিত হয়েছেন এই সহজ অঙ্কটা মাথায় রেখে যে প্রায় একশো কোটি জনসংখ্যার এই দেশে পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ কোটি জনস াধারণ মধ্যবিত্ত এবং তাদের সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান এবং বস্তুতপক্ষে এদেরই ক্রয়ক্ষমতার জোরে ভারতে তারা একটি বির াট বাজার পেয়ে যাবে। পুনর্মূল্যায়িত হিসেবে সংখ্যাটা পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ-এর বদলে উনিশ থেকে কুড়ি কোটিতে নেমে গেলেও একথা মানতেই হবে যে অর্থনীতির উদারীকরণ তথা বিশ্বায়নের ফলে মধ্যবিত্তের গুত্ব আজ স্পষ্টতই অনেকখানি বেড়ে গেছে বিশেষত বহুজাতিক এবং অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যসংস্থাগুলির কাছে। যার ফলশ্রুতি হিসেবে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইলেকট্রনিক ও অন্যান্য মিড়িয়ার মাধ্যমে উচচ ও উচচমধ্যবিত্ত জীবনযাত্রার প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়ে তোল ার নিরলস প্রয়াস। শুধুমাত্র বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নয়, যত বিচিত্রভাবে সম্ভব ততভাবে। বলাবাহুল্যনববই-এর পরিবর্তিত অর্থনীতি বা সংবাদমাধ্যমগুলির ক্রমবর্ধমান গুত্ব কোনোটাই আমাদের আলোচ্য নয়। আমরা শুধু মনে রাখতে চাইছি এর অনিবার্য পরিণাম নববই-এর সেই বদলে যাওয়া মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে যেখানে অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয় আর কে ানো গর্হিত কর্ম নয়। ভোগ্যসামগ্রী আহরণ ও উপভোগে কোনো অপরাধ নেই বস্তুত এসবই এখন সুখী জীবনের লক্ষ্য এবং যে কোনো মূল্যে তা অর্জন করতে মধ্যবিত্তের কোনো দ্বিধা নেই এবং হয়তো যতদিন যাবে তত আরোই থাকবে ন া। নববই -এর তণ প্রজন্ম সম্বন্ধে২২. ০৩. ০৩ তারিখে আনন্দবাজারের 'শেষ দশক' ক্রোড়পত্রে নবনীতা দেবসেন তাঁর প্রবন্ধে (সকালে গৃহিনী, বিকেলে বিকিনি, সন্ধ্যাবেলা পূজারিণী, মন্দ কী) যেকথা লিখেছেন তা উদ্ধৃত করার লোভ

সংবরণ করা কঠিন। নবনীতা লিখেছেন, 'ওরা দেখতে পাচ্ছে সাফল্যের সংজ্ঞা বদলে যাচ্ছে, সততার বাজারি মূল্য ধসে যাচ্ছে, স্ফূর্তিরও সংজ্ঞা বদলে যাচ্ছে। সারা বিশ্বের কাজকর্ম ওদের হাতে কলমে একটা মূল্যবোধ শেখাচ্ছে। সারভাইভ্যাল অব দ্য ফিটেস্ট প্রণালীতে ওদের বিশ্বাস, এটাই টিকে থাকার উপায়।' অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয়, ভোগ্যসামগ্রী আহরণ ও উপভোগ যখন মধ্যবিত্ত সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছে তখনই দেখা দিয়েছে এক অবশ্যম্ভাবী সাংস্কৃতিক পরিবর্তন যার মূলে আছে কিছু মনোভঙ্গি বা mind setএর পরিবর্তন। সমকালীন মধ্যবিত্ত বাঙালির এই পরিবর্তিত মানসিকতা আমরা অনেকেই লক্ষ্য করেছি এবং এখনও করছি আমরা প্রত্যেকেই এই চলমান ইতিহাসের অংশ, এই নব নাট্যের পাত্রপাত্রী তথা কুশীলব এবং সাক্ষী। কী সেই পরিবর্তিত মানসিকতা বা মনোভঙ্গি? সূত্রাকারে বললে বলতে পারা যায়

১। পণ্যমনস্কতার চাপে আপোষহীন আদর্শবাদের মৃত্যু।

২। মেনে নেওয়া ও মানিয়ে নেওয়ার এক নতুন নৈতিকতা।

৩। এক প্রতিযোগিতামুখী আত্মপ্রত্যয়ী ও একই সঙ্গে আগ্রাসী মনোভাব।

৪। বত্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যত্তিকেন্দ্রিকতার বিভাজন রেখাটির ক্রমবিলুপ্তি।

৫। প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার স্থলে প্রতিষ্ঠানকে নিজের বা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার বাmanip-ulation -এর প্রবণতা।

বলাবাহুল্য এই সূত্রগুলি একেবারেই আমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি সঞ্জাত ফলে সবাই নিজেদের প্রয়োজনমতো যোগ বিয়োগ করে নিতে পারেন অবশ্যই। আমার বলার কথা শুধু এটুকুই যে মনোভঙ্গির এই পরিবর্তনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে আছে এক সাংস্কৃতিক পরিবর্তন। বিশ্বায়ন পরবর্তী ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত সমাজ আজ এক নতুন সাংস্কৃতিক আবহে নিজেকে গড়ে তুলতে সচেষ্ট। ব্যত্তিই সেখানে স্বরাট, আপোষই প্রধান পন্থা, চাওয়াই মূলমন্ত্র এবং পাওয়াই একমাত্র লক্ষ্য।

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরেরও কিছু বেশি সময় পরে নতুন অর্থনীতি তথা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও সংবাদ মাধ্যমের দৌলতে ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণী আজ যেমন নানা গবেষণা ও আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে তেমনি চর্চার বিষয় হয়েউঠেছে মেয়েরাও। বলাবাহুল্য মেয়েদের কথা বলতে আমি এখানে মধ্যবিত্ত মেয়েদের কথাই বলতে চাইছি। ১৯৫০-এ সাংবিধানিক সমানাধিকার লাভের পর নানান চড়াই উৎরাই পার হয়ে মেয়েরা আজ এমন এক অবস্থানে এসে পৌঁছেছে যেখানে তারাও সমানভাবে সুযোগ নিতে পারে এই বিশ্বায়ন তথা মুত্ত অর্থনীতির। মানিয়ে নিতে পারে নিজেদের এই বদলে যাওয়া জীবনবোধের সঙ্গে। 'মানিয়ে নেওয়া' শব্দবন্ধটি আমি খুব সচেতনভাবেই ব্যবহার করছি।কারন আগেই জানিয়েছি আপোষ-এর ঘনিষ্ঠআত্মীয় এই শব্দবন্ধ এখন আর কোনো গর্হিত মূল্যবোধ স্পৃষ্ট নয়। মেনে নেওয়া বা মানিয়ে নেওয়া-য় এখন আর ব্যত্তিস্বাতন্ত্র্যের লাঘব নেই বরং স্বীকৃতি আছে বাস্তববাদিতার। বস্তুত ভোগবাদী সংস্কৃতির নিরিখে মেয়েদের এই বদলে যাওয়া মানসিকতাকেই আমরা দেখাবার চেষ্টা করব অন্যতম পরিচিত কথাসাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরী-র এই সময়ের কয়েকটি উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠবে, কেন উপন্যাস? এবং কেনই বা রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাস ? একে একে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি। প্রথমত আমরা জানি যে সাহিত্য বিশেষত উপন্যাস কোনো না কোনোভাবে সমাজমনকে প্রতিবিম্বিত করে তাই মনে হয়েছে ভবিষ্যতে এই সময়ের সামাজিক ইতিহাসের আলোচনায় এইসব সাহিত্যিক উপাদানের মূল্যও হয়তো একদিন স্বীকৃতিপাবে -- আজকের এই লেখা সেই ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে। দ্বিতীয়ত স্বাধীনতা লাভের পর যাঁরা বাঙলা ভাষায় উপন্যাস লিখেছেন বা লিখছেন তাঁদের মধ্যে রমাপদ চৌধুরী বিশেষভাবে বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার হিসেবেপরিচিত এবং যাঁরা তাঁর লেখা পড়েন তাঁরা অবশ্যই জানেন যে নববই-এর দশকে এসে পরিণত এই কথাসাহিত্যিক মধ্যবিত্তের পরিবর্তিত মূল্যবোধ তথা জীবনচেতনার স্বরূপ ও সার্থকতা নির্ণয়ের প্রশ্নে বিশেষভাবে বেছে নিয়েছেন মেয়েদের। ভেতরের, বাইরের সমস্ত রকম প্রতিবন্ধকতাকে কাটিয়ে উঠে তারাই প্রতিষ্ঠিত করেছে এই নতুন জীবনসত্যকে। নববই-এর, ভোগবাদী সংস্কৃতি ও পরিবর্তিত মূল্যবোধকে মেয়েরা কেমনভাবে গ্রহণ করল, কেমন করে মানিয়ে নিল নিজেদের, আদায় করে নিল

নিজেদের চাহিদার সবটুকু আমাদের এই আলোচনা তারই কিছু সূত্র সন্ধানের প্রয়াসমাত্র।

নববই-কে বুঝতে গেলে তার অব্যবহিত পূর্ববর্তী দশকটিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা চলে না কারণ সামাজিক পরিবর্তন সবসময়েই ধারাবাহিকভারে চলে, বিস্তৃত হয়ে থাকে পর্ব থেকে পর্বান্তরে। আমরা আলোচনা আরম্ভ করছি রমাপদ-র আশির দশকে প্রকাশিত একটি উপন্যাস দিয়ে। উপন্যাসটির নাম 'চড়াই'। রচনাকালের দিক থেকে সামান্য পরবর্তী হলেও ভাববস্তু বা থীমের দিক থেকে 'চড়াই' রমাপদ-র 'হৃদয়' বা 'বীজ' উপন্যাসেরই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। 'হৃদয়' উপন্যাসের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দের সমানুপাতে মানবিক সম্পর্কের ক্ষয় কিংবা 'বীজ' উপন্যাসে সভ্যতার প্রকৃত অর্থের অন্বেষণ, সর্বপ্রকার আদর্শভ্রষ্ট, ভোগসর্বস্ব জীবমোহ-ই নতুন করে ফিরে এসেছে চড়াই-তে। শঙ্করের 'সীমাবদ্ধ' বা সমরেশ মজুমদার -এর 'দৌড়' উপন্যাসের সঙ্গে আপাত ভাবসাদৃশ্যে 'চড়াই' -কেও কেউ কেউ ভেবেছেন ওপরে ওঠার গল্প। এমনকি উপন্যাস লেখার বহুদিন পরে 'উপন্যাস সমগ্র'-র প্রসঙ্গকথায় রমাপদ নিজেও এইভাবেই গল্পটিক দেখেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে 'চড়াই' উপন্যাসে কিছু কিছু চরিত্রের ওপরে ওঠার কথা থাকলেও বিষয়টিকে আদৌ তাদের দিক থেকে দেখা হয় নি, দেখা হয়েছে সেই সব মানুষের চোখ দিয়ে যারা স্পষ্টতই এদের উল্টোপিঠ। অথচ ওপরে ওঠার দুর্নিবার আকর্ষণে ছুটতে থাকা মানুষগুলির সঙ্গে এদের অধিকাংশেরই সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ-কেউ ভালবাসা বঞ্চিত স্ত্রী, কেউবা অসহায় পিতা অর্থাৎ এই ভয়ঙ্কর ক্রমারোহণ পদ্ধতির এরা সুদূর দর্শক বা সমালোচক মাত্র নয় ভুক্তভোগীও বটে। 'চড়াই' আসলে এদেরই প্রতিবাদের গল্প। আর যে মানুষটির মধ্যে এই প্রতিবাদ সবচেয়ে সোচ্চার, জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য নিরাপত্তা সমস্ত কিছুর বিনিময়ে কেবলমাত্র নিজের মনের জোরে যে এই ক্রমধাবমানতার চক্র থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেয়, সে এই উপন্যাসের নায়িকা নিরূপা। একটি সাধারণ মধ্যবিত্তপরিবারের এই সাধারণ শিক্ষিত মেয়েটিই রমাপদ-র পুষ প্রধান উপন্যাস ধারায় প্রথম যথার্থ নায়িকা।

সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে নিরূপা। তার শিক্ষা দীক্ষা চি অসাধারণ কিছু না হলেও আর পাঁচজনের থেকে আলাদা। ছোটবেলা থেকেই সে একটু একা একা চুপচাপ। অন্য অনেক মেয়ের মতো শাড়ি গয়নার দিকে অতিরিক্ত কোনো ঝোঁক নেই। সম্বন্ধ করেই তার বিয়ে হয়েছিল অবনীর সঙ্গে। নিরূপার দাদা অভি বলেছিল অবনীর চাকরিতেনাকি 'প্রসপেকট' আছে। কিন্তু নিরূপার কাছে এসব কথার আলাদা কোনো মূল্য ছিল না কারণ অবনীকেই তখন ওর ভালো লেগে গিয়েছিল হয়তো ভাল লাগবার জন্য মনটাকেই তখন ও তৈরি করে রেখেছিল। বিয়ের পরেও নিরূপা সত্যিই সুখী হয়েছিল কিন্তু আস্তে আস্তে সব বদলে গেল। অবনী ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে আরম্ভ করল। নিরূপাপ্রথমে খুশিই হয়েছিল, অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বামীর আনন্দকে নিজের আনন্দ মনে করে অবনীর উন্নতির খুশিতে পার্টিদিতে রাজি হয়েছিৎ. হয়তো সেই শু। তারপর থেকে নানান ছোটখাটো ব্যাপারে নিরূপার মনে ক্ষোভ জমতে লাগালতবু মানিয়ে নেওয়ার মানিয়ে চলার চেষ্টা করেছিল নিরূপা এমনকি অবনী ওকে ওর বৌদি চন্দনার মতো আদব কায়দার অভ্যস্ত হতে বললে নিরূপার ভেতরের জেদী মেয়েটা বিদ্রোহ করতে গিয়েও থমকে গিয়েছিল ভেবেছিল ওটা তার স্বামীর নিছকই আপিসের পোশাক পরা চেহারা। কিন্তু ক্রমশ দেখল ওই আফিসের পোশাকটাই অবনীর জীবন, তার সমস্ত অস্তিত্ব শুধু ওপরে, আরো ওপরে ওঠার জন্য ব্যাকুল।

অবনী নানা বিষয়ে পড়াশোনা করত এবং তা নিয়ে নিরূপার ভেতরে ভেতরে একটা গর্বও ছিল। তবু একদিন বলেছিল, 'এত সব সাবজেক্ট একটু একটু জেনে কি লাভ যে কোনো একটি বিষয় নিয়ে স্টাডি করলেও তো পার'। অবনী হেসে উঠেছিল-- 'আমি কি রিসার্চ করব নাকি হাফ ফেড অধ্যাপকদের মতো। সব কিছু আমার কিছু কিছু জানলেই চলে। শুধু ওয়েল ইনফর্মড থাকতে পারলেই দিব্যি কাজ চালিয়ে যাওয়া যায়, ইমপ্রেস করা যায়।' কথাগুলো শুনে ভুল ভেঙেছিল নিরূপার। তাহলে সবই চাকরি ? চাকরিতে উন্নতি ? কিংবা কাউকে ইমপ্রেস করা ? নিরূপা যখন রেডিও খোলে, রেকর্ড বাজায়, রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরে নিজেকে হারিয়ে ফেলে তখনও অবনীর যে মনোযোগ দেখেছে তা কি শুধু দামী ফ্ল্যাটের বন্ধু- পত্নীদের আড্ডায় দু- এক কলি আউড়ে দেওয়ার লোভে ? রবীন্দ্রসদনে নাটক দেখে বা সিনেমা হলে ভ

াল ছবি এলে, তারি কি শুধু নিজেকে কালচার্ড প্রতিপন্ন করার জন্য? আনন্দ পাবার জন্য নয়? উপভোগ করার জন্য নয়? অথচ নিরুপার তো মনে হয় এইসব উপভোগের সামগ্রীগুলো আছে বলেই ভোগের সামগ্রীগুলোর দাম। অবনীকে সেদিন খুব ছোট মনে হয়েছিল আর হয়তো তখনই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল তার ভবিতব্য, অবচেতনে নিরুপাও হয়তো বুঝেছিল এভাবে আর বেশিদিন চলবে না। স্বামী অনেক ওপরে উঠলে, বড় হলে, সে তোখুব গর্বের কথা। কিন্তু মানুষটা বদলে যায় কি করে? ভালোবাসা বদলে যায় কি করে? অবনী বলত 'আই মাস্ট গোআপ, দ্যা স্কাই ইজ দ্য লিমিট' আর নিরুপা ভাবত 'যত ওপরেই ওঠো, তার ও ওপরে কেউ আছে, থাকবে। তুমিকত বড় হতে পারো?' ওপরে ওঠার নেশায় অবনীর কাছে ব্যক্তি নিরুপা, তার ভালোলাগা, মন্দলাগা ক্রমশ মূল্যহীন হয়ে যায়। নিরুপা হয়ে ওঠে এক পুতুল। অবনীর বিছানায়, ক্লাবে সঙ্গ দেবার পুতুল, পার্টিতে তার গ্লামার বাড়ানোরসাজসরঞ্জাম। আপিসের চেম্বারে যেমন রিভলভিং চেয়ার, মেঝেতে কার্পেট, লাল রঙের টেলিফোন, ডিকটাফোন, পাশে সুন্দরী মেয়ে সেক্রেটারী আরও কত কি দিয়ে ওর ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায় তেমনি বাইরের জগতে নিরুপাও শুধু ওর ব্যক্তিত্ব প্রকাশের সাজসরঞ্জাম। মতান্তর ও মনান্তরের চরম পর্যায়ে অবনী একসময় বলেই ফেলে 'দেন উই মাস্ট সেপারেট আওয়ার সেলভস্।' বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যায় নিরুপা, ঝোঁকের মাথায় প্রথমে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয় আবার ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসার পর নিজেই বোঝে অবনীর জন্য মরতে যাওয়াটা কত বড় বোকামি, কত বড় অপচয়। মেনে নেওয়া আর মানিয়ে চলার প্রচলিত ছক ভেঙে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিরুপাকে এমন এক উচচতায় পৌঁছে দেয় যেখান থেকে দেখলে অবনীদের সত্যিই খুব ছোট দেখোয়। 'বীজ' উপন্যাসে এই ভোগবাদী উপকরণের সভ্যতার প্রকৃত সমস্যা আর তাই থেকে উত্তরণের পথ সন্ধান করেছিলেন শশাঙ্কশেখর একেবারেই দার্শনিক ধরণে আর নিরুপার প্রতিবাদ ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতাপ্রসূত এর ভালোমন্দের যাবতীয় দায়িত্ব একান্তই তার।

বিয়ের অনেক বছর পর নিরুপার মতো প্রায় একই সমস্যার মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় নববই-এর শেষের দিকে লেখা 'তিনকাল' উপন্যাসের নায়িকা অমিতা। ছাত্রাবস্থা থেকে যথেষ্ট স্বাধীনচেতা, ব্যক্তিত্বসম্পন্না এবং চাকরিসূত্রে একদা অর্থনৈতিকভাবেও স্বাবলম্বী অমিতা হঠাৎ-ই একদিন নিজেকে আবিষ্কার করে এক নিতান্ত অসুখী মধ্যবয়সী গৃহিনীর ভূমিকায় --জীবনের কোনো কিছুতেই যার আর কোনো উৎসাহ নেই। বয়স তাকে দিয়েছে কিঞ্চিৎ মেদ এবং সব বিষয়েএক ধরনের অনুৎসাহ। যে স্বামী, সন্তান তথা সংসারের জন্য অমিতা একদিন চাকরি ছেড়েছে তারা কেউই শেষপর্যন্ত তাকে কাঙিক্ষত পূর্ণতা দিতে পারে নি। চাকরিতে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবোধ ও চি বদলের কারণে স্বামীর সঙ্গে তার দূরত্ব বেড়েছে। অন্যদিকে বড়ো হয়ে যাওয়ার ফলে ছেলেমেয়েদের কাছেও তার প্রয়োজন ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এসেছে এবং সংসারে তার ভূমিকাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে নিছক বেতনভোগী কেয়ারটেকার -এর। বলা বাহুল্য এর কোনোটাই একদিনে হয়নি এবং দীর্ঘদিন ধরে অমিতা তা মেনেও নিয়েছে। কিন্তু হঠাৎই একদিন তার মনে হয়েছে পায়ের তলায় যেন মাটি নেই, যেন ও একটা অন্ধগলির মধ্যে ঢুকে পড়েছে, বেরোনোর রাস্তা নেই। আসলে একদিকে স্বামীর সঙ্গে মূল্যবোধ ও চির তফাৎ অন্যদিকে যৌবন ফুরিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দুইয়ে মিলেই অমিতার সমস্যাকে আরো জটিল করে তুলেছে এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্বামীর বিবাহাতিরিক্ত সম্পর্কের ইঙ্গিত। স্বামীর ব্যবহারকে তার দাম্পত্য জীবনের তথা ব্যক্তিসত্তার অবমাননা বলে মনে হয়েছে এবং নিরুপার মতো সেও গৃহত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তার নিজের মেয়ে মুকুল। নতুন প্রজন্মের বাস্তববুদ্ধির কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে তার আত্মসম্মানের প্রশ্ন। 'মৃদু হাসল মুকুল। বলল সেল্ফ রেসপেক্ট? ওটা একটা ছেঁদো কথা। তোমাদের যুগেরর কথা।' এ যুগে মানুষকে প্র্যাকটিক্যাল...তোমার এই সাতচল্লিশ বছর বয়সে কে চাকরি দেবে, কিসের ওপর দাঁড়াবে? আমাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবেছ? দাদুর ওই পেনসনের টাকায় ওই পোড়ো বাড়িটাই মেরামত করতে পারে না। আমরা তো তোমার মতো কষ্টে মানুষ হইনি মা। হতে দাওনি, এই ফ্ল্যাট, এই গাড়ি, এই সব পোশাক, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনদের সমীহ এসব ছেড়ে তুচ্ছ একটা আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকা যায় না মা, বেঁচে থাকা যায় না।' বস্তুত এই অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রশ্নেই অমিতা শেষপর্যন্ত নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছে। অমিতা শেষ পর্যন্ত নিরুপা হতে পারে না। হয়তো বয়সের কারণেই তার চরিত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চেয়ে অভিমানবোধ তীব্র। তীব্রতর পরনির্ভরতা, তাই

ব্যক্তিগতভাবে সংসারত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েও তাকে সন্তানদের সম্মতির অপেক্ষায় থাকতে হয় এবং শেষপর্যন্ত অসহায়ভাবে পরিস্থিতিকে মেনে নেওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না--- 'এখন এতকাল পরে অমিতার মনে হল, আমার আর কিছুই করার নেই, একটা বিধবস্ত চেহারা নিয়ে শুধুই অপেক্ষা করে থাকতে হবে। বিবর্ণ মুখে।' কিন্তু এ গল্প তো শুধু অমিতার নয় তার আত্মজা মুকুলেরও। মুকুল সেই নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি যাদের কাছে 'আত্মসম্মান', 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য' প্রভৃতি আদর্শের মোড়ক পরানো শব্দগুলো ততক্ষণই মূল্যবান যতক্ষণ তা বস্তুসুখের, নিশ্চিত নিরাপদ আশ্রয়ের পরিপন্থী নয়।এরা বাস্তববাদী এবং এই বাস্তববাদিতা বা Pragmatism-এর দিকটিও অস্বীকার করার মতো নয়।

মুকুলের অন্যপিঠে আসে এই দশকেরই আরেকটি উপন্যাস 'পাওয়া'-র (১৯৯৪) নায়িকা রিমি। সে বড় হয়ে ওঠে বিবাহবিচ্ছিন্না মায়ের তত্ত্বাবধানে বাবার অস্তিত্ব বর্জিত পুরোপুরি মাতৃতান্ত্রিক একটি পরিবারে। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই সে শেখে তার বাবা সুবিমল নিতান্তই 'অমানুষ', 'জানোয়ার' এবং তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী রঞ্জনা নিতান্ত খারাপ মেয়ে'। পরে বাবার সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁর বাড়িতে গিয়ে তারই জন্য রাখা সম্পদ, বিয়ের গহনা প্রভৃতি দেখতে দেখতে তার কখনো মনে হয়,'এত টাকা এত গয়না, এত ভালোবাসা ওর অজ্ঞাতে এতদিন জমা ছিল ও জানতেও পারে নি। অথচ' এ-সব কিছুই না থেকে যদি জানতে পারত শুধু ভালবাসা আছে, তাহলে জীবনভোর এত যন্ত্রণা পেত না,এত লজ্জা।' এতদিন পর সুবিমলকে বাবা বলে রিমি মেনে নিতে পারে না, টাকা-পয়সা, অলঙ্কার, সামাজিক মর্যাদা কোনো কিছু 'পাওয়া'-র লোভেই বিসর্জন দিতে পারে না নিজের মর্যাদাবোধকে। এমনকি তার বিয়েতে সুবিমলের সম্প্রদান করার প্রস্তাবেরও তীব্র বিরোধিতা করে সে কিন্তু পাশাপাশি ব্যক্তি সুবিমলের অনুভূতিকেও সে বুঝতে পারে, কল্পনা করতে পারে আরেক ধরনের ভালোবাসার জন্য মানুষ কতখানি পাগল হয়ে যেতে পারে। মায়ের দুঃখ, লজ্জা, অপমান সব ভুলে মুহূর্তের জন্য ওর ইচ্ছে করে ওই দুটি মানুষকে ক্ষমা করে দিতে। অপরাধী ওরা দুজনেই কিন্তু মনে হয় দু'জনেই মানুষ। কোথাও যেন মানুষের চেয়েও বড়। হয়তো এও একধরনের আপোষ কিন্তু এ আপোষে স্বার্থচিন্তা বা আত্মমর্যাদার লাঘব নেই আছে নিজের পাশাপাশি অন্যের স্বাতন্ত্র্যকে, স্বাধীন ভালোলাগা, মন্দলাগাকেমেনে নেওয়ার শক্তি।

এই বদলে যাওয়া মানসিকতা রমাপদ -র যে নারীচরিত্রে সবচেয়ে সার্থকভাবে রূপায়িত সে'জৈব' উপন্যাসের সুতনুকা। মাইক্রোবায়লজিস্ট সুতনুকা সত্যিই অনন্যা। সে সাধারণের একজন নয়--অনন্যসাধারণ--'ওয়ান অব দেম থেকেএকজন, একমেব' হয়ে ওঠাই তার জীবনের অন্যতম লক্ষ্য। জীবনের একটা বড়ো অংশ সে কাটিয়ে এসেছে আমেরিকায় ফলে মধ্যবিত্তের পরিচিত সংস্কার তথা মূল্যবোধের দায় থেকে সে অনেক পরিমানে মুক্ত। সে নিজেই তার বান্ধবীকে বলে '...আমি অন্যদের মতো নয়। আমি আমার মতো। আমার নিজেরও কতগুলো ন্যায়নীতি আছে, ভ্যালুজ আছে, সেগুলো আমি মেনে চলি।' অন্যদের সঙ্গে সুতনুকার মোটেই মিল নেই। তার কোনো এক বয়ফ্রেণ্ড সম্বন্ধেমোতল্লাসি চালানোর চেষ্টা করলে সে অকপটে বলে--'আড্ডা দিই। বেড়াই। ও তো আমার বন্ধু,..হঠাৎ কোনও কোনও দিন জাস্ট চুমু। কেন তোমার আপত্তি আছে?' সাজসজ্জা, চালচলন, চিন্তাভাবনা, সংস্কার সবেতেই সেঅন্যরকম। প্রথম আলাপেই নিতান্ত অপরিচিত যুবককে সে অবলীলায় 'তুমি' বলে সম্বোধন করতে পারে তারপর আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে তাকে বিয়ে করে; প্রবাসে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর সেবাযত্নে তাকে সরিয়ে তোলে আবার মানসিক সামঞ্জস্য হল না বলে তাকে ছেড়ে স্বদেশে ফিরে আসে এবং তার পরেও তার সঙ্গে সহজ সম্পর্ক বজায় রাখে।

স্রেফ বন্ধুত্ব থেকেই সুতনুকা প্রদীপ্তকে বিয়ে করে ফেলে এবং পরে তাকে ছেড়ে আসার পর আবার বন্ধু হয়ে যায়। সম্ভবত উপযুক্ত শব্দের অভাবেই প্রদীপ্তর সঙ্গে সম্পর্কটাকে সুতনুকা বন্ধুত্ব বলে অভিহিত করে কারণ তাদের সম্পর্ক কখনোই সেই অত্যাগসহন স্তরে পৌঁছয় না যেখানে গেলে প্রদীপ্ত তার হীনমন্যতা ভুলতে পারে। দাম্পত্যজীবনের এই সংকটপর্বে সুতনুকা-র কর্মক্ষেত্রও ক্রমশ সমস্যা সঙ্কুল হয়ে ওঠে। প্রাথমিক পর্যায়ে আমেরিকা সুতনুকার গবেষণার স্বপ্ন সফল করতে পারে না কারণ সেখানে সবটাই 'প্রফিট মোটিভ'। খানিকটা এই কারণে খানিকটা দাম্পত্যসমস্যা এড়াতে

ভবিষ্যত বিসর্জন দিয়ে সুতনুকা ফিরে আসে স্বদেশে। সুতনুকার ভাষায় 'কিছু একটা হওয়ার' স্বপ্ন পরিত্যাগ করে 'কিছু না হওয়ার' জগতে। কিন্তু তথাকথিত এই না হওয়ার জগতেই প্রখ্যাত জেনেটিসিস্ট মিঃ সোয়ামি-র প্রতিষ্ঠানে সে আব ার নতুন করে বেঁচে ওঠার অবলম্বন পায়। এই প্রতিষ্ঠানটির অবস্থান সুতনুকার প্রাক্তন কর্মক্ষেত্রের সম্পূর্ণ বিপরীতে। ফল নয়, এখানে খোঁজাটাই বড়। এই প্রতিষ্ঠানে সুতনুকার নতুন করে বেঁচে স্বপ্নে জড়িয়ে যায় আরেকটি নাম মিঃ সোয়া মি। সুতনুকা মনে মনে বলে 'সোয়ামি তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, কৃতজ্ঞ। আমি নিজেকে একটা ভ্যাকুয়াম ভাবতাম, বিধবস্ত, মূল্যহীন। এখন আমি নিজেকে 'আমি' ভাবতে পারি। তুমি আমার...সব শূন্যতা দূর করে দিয়েছ। জীবনের সব ব্যথা দূর করে দিয়ে একটা স্বপ্ন দিয়েছে। সে স্বপ্ন দেখার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছ, আমার হাতে তোমার হাত, স্বপ্ন দেখছি, একটা অচেনা পরোপকারী নতুন ব্যাকটিরিয়া খুঁজে বের করার স্বপ্ন, যাএই কলকাতা, পৃথিবীর সমস্ত শহরকে আবর্জনা মুক্ত করে দিতে পারে।' সোয়ামি-র আপাত আকর্ষণহীন চেহারা, সুতনুকার সঙ্গে বয়সের দুস্তর ব্যবধান প্রভৃতি সত্ত্বেও তাদের মধ্যে এক আশ্চর্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে--এই প্রথম এমন একজনের সঙ্গে সুতনুকার সম্পর্ক তৈরি হয় যে শিক্ষায় ও মননে সুতনুকার কাছাকছি হয়তো খানিকটা ওপরেই। পৃথক নামের অভাবে এ সম্পর্কটিকেও সুতনূকা বন্ধুত্ব বলে অভিহিত করে যদিও এটি প্রদীপ্তর সঙ্গে তার সম্পর্কের সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রদীপ্ত নিজের হীনমন্যতার কারণে সুতনুকাকে পদে পদে ছোট করে আর সোয়ামি তাকে দেয় আত্মবিশ্বাস তথা আত্মসম্মানবোধ। বলাবাহুল্য সুতনুকার ইনটেলেকচুয়াল ইগো চরিতার্থতা লাভ করে মি সোয়ামি-র সান্নিধ্যে। সুতনুকা বলে 'জীবনের এই স্বাদ আমি আর কখনো পাইনি কারণ আমরা দু'জনেই পরস্পরের কাছে কিছুই চাই না। নাও আই অ্যাম ইন পারফেক্ট হ্যাপিনেস।' কিন্তু এই পর্বেই আবার তার জীবনে আসে অনুরূপ। অনুরূপের শারীরিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয় সুতনুকা, তারই সম্পর্কে জীবনে প্রথম তথাকথিক প্রেমের স্বাদ অনুভব করে সে। অনুরূপ বিয়ের প্রস্তাব দিলে সুতনুকার ভেতরে ভেতরে একটা অ ানন্দ গুনগুন করে ওঠে অথচ বুদ্ধি দিয়ে ও স্পষ্টই বোঝে এ একধরনের রূপের প্রতি আকর্ষণ, ও যাকে চায় সে অনুরূপ নয়। সুতনুকা ব্যক্তিগত ভাবে অনুরূপকে বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নেয় অথচ অনুরূপ তার পূর্বপ্রতিশ্রুতি মতো ওর সঙ্গে যোগাযোগ না করলে ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়ে। অনুরূপকে ভালোবেসেও সুতনুকার বারবারই মনে হয় 'ও কেন প্রদীপ্তর মতো বন্ধু নয়, ও কেন সোয়ামি নয় যে আমার মধ্যে একটা বিরাট সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছে, দেখাতে পেরেছে।...অনুরূপ কেন ইহুদি এচেভেরিয়ার মতো আমার মগজটাকে অ্যাডমায়ার করে না। শুধু রক্তমাংস দেখে, লে াভীর মত চুমু খেতে চায়, চাকরি বলতে বোঝে মাইনের অঙ্কটা।' আসলে সুতনুকা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই অদ্বিতীয়া হয়ে উঠতে চায়। সে নিজের রূপের প্রশংসা শুনতে যতটা ভালবাসে ততটাই আকাঙ্ক্ষা করে গুণের স্বীকৃতি। পুষের সহমর্মিতা তার যতখানি প্রয়োজন ততটাই আত্মপ্রসাদ স্তাবকতায়। সে বারেবারে ভাবে-- '...এমন একজনকে যদি পেত াম, যে একই সঙ্গে প্রদীপ্ত, অনুরূপ, সোয়ামি, এচেভেরিয়া আর সেই পাশে বসা মার্কিন সহপাঠী ফাজিল ছেলেটি। কে ানও জাদুবলে কেউ যদি এদের সকলেকে একজন বানিয়ে দিত। কারণ আই নীড দেম অল।' কিন্তু নিছক ভালোবাসা নয় সুতনুকার প্রয়োজন আরো বড়। কিছু করা এবং হওয়াই তার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। এই বৃহত্তর প্রয়োজনের তা গিদেই মানবিক সম্পর্কের জটিল গোলোকধাঁধা থেকে বেরিয়ে উপন্যাসের শেষে সুতনুকা উড়ে চলে আমেরিকায়, ইহুদি এচেভেরিয়ার নতুন গবেষণার আমন্ত্রণে। বলাবাহুল্য এই সুতনুকারাই সাংস্কৃতিক পালাবদলের যথার্থ প্রতিনিধি। সমস্ত রকম ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা তথা সামাজিক প্রতিকূলতাকে তুচ্ছ করে তারাই হয়ে ওঠে নতুন যুগের ধাত্রী, নতুন মূল্যবোধের ধারক ও বাহক। আত্মপ্রতিষ্ঠায় মগ্ন, আত্মপরিচয়ের সন্ধানে নিরত, এই মেয়েরা যোগ্যতা ও জ্ঞানস্পৃহার জোরে পুষশাসিত সমাজের মূল্যবোধকে আত্মস্থ করে ক্রমশ এমন একটি পরিণত মানসিকতা অর্জন করে যেখানে তারা সমস্ত পরিস্থিতিকে জয় করতে পারে, আদায় করে নিতে পারে নিজেদের চাহিদার সবটুকু।